যুগান্তর

13 SEP 2009

পৃষ্ঠা ... 8 ... কলাম ... 2

# ছাত্রলীগকে নিয়ন্ত্রণ করুন

**যখন যে দল ক্ষমতায় থাকে, তাদের সহযোগী ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীদের চাঁদাবাজি-টেন্ডারবাজি উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছে। ছাত্রনেতাদের কতটা অধঃপতন ঘটলে তারা ছিনতাই-সন্ত্রাসে ইন্ধন দেয় তা বোধগম্য।**

ছাত্রলীগের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে তথ্য চেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে চিঠি পাঠানোর খবর আশাব্যঞ্জক। এর মাধ্যমে সরকার কার্যত ছাত্রলীগের অপকর্মগুলো স্বীকার করে নিয়েছে। সংগঠনটির লাগাম টেনে ধরতে সরকার এখন কী পদক্ষেপ নেয়, সেটাই দেখার বিষয়। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন ছাত্রলীগ চাঁদাবাজি ও টেন্ডারবাজিতে জড়িয়ে পড়েছে— এ খবর নতুন নয়। মহাজোট ক্ষমতায় আসার পর থেকেই নিয়ন্ত্রণহীনভাবে চলছে সংগঠনটি। বিভিন্ন স্থানে এর নেতাকর্মী ও সমর্থকরা শুধু চাঁদাবাজি ও টেন্ডারবাজি নয়— দখলদারিত্ব, অবৈধ ভর্তি বাণিজ্যেও জড়িয়ে পড়েছে। ইদানীং ছিনতাইয়ের ঘটনায়ও ছাত্রলীগের কর্মী সম্পৃক্ত থাকার খবর প্রকাশ পেয়েছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে টেন্ডারবাজির ন্যক্কারজনক ঘটনার জন্ম দিচ্ছে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। এসব ঘটনা সরকারকে শুধু বিব্রতকর পরিস্থিতিতেই ফেলছে না, তাদের ভাবমূর্তিও ক্ষুণ্ন করছে। ইতিপূর্বে ছাত্রলীগের দু' গ্রুপের সংঘর্ষে বেশ ক'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। একপর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক নেতৃত্ব ত্যাগ করেন। ছাত্রলীগের যারা সন্ত্রাস-চাঁদাবাজি করছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দেন তিনি। সংগঠনের শীর্ষ পর্যায় থেকেও বলা হয়েছে, ছাত্রলীগের পরিচয়ে কেউ টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস করলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। কয়েকটি বহিষ্কারের ঘটনাও ঘটেছে। কিন্তু তাতেও ছাত্রলীগকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি। বিভিন্ন স্থানে তারা একের পর এক ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে নানা অপরাধ কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে। আমরা মনে করি, সরকার এ ব্যাপারে প্রকৃতই কঠোর হলে ছাত্রলীগকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। গোয়েন্দা সংস্থার সূত্রে যুগান্তরের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে সংগঠনের শীর্ষ নেতারা সরাসরি মদদ দিচ্ছেন। কেউ কেউ বখরা নিচ্ছেন এজেন্ট নিয়োগ করে। তাতে ভাগ বসাচ্ছেন মধ্যম ও নিচের সারির নেতারাও। সংগঠনের নেতারাই যদি অপরাধকর্মে উৎসাহ দেন, তাহলে তা বন্ধ হবে কিভাবে? সরকারকে এই জায়গায় হাত দিতে হবে। আরেকটি বিষয় হল পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা। সম্প্রতি খাদ্যভবনের টেন্ডার ভাগাভাগি নিয়ে ছাত্রলীগ ও যুবলীগ সমর্থক দু'দল ঠিকাদারের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ হয়। বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীর নামে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও টেন্ডারবাজির ঘটনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুলিশ ব্যবস্থা নিতে পারছে না মূলত রাজনৈতিক প্রভাব বা চাপের কারণে। দলীয় পরিচয়ধারী চাঁদাবাজ-টেন্ডারবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের হাত-পা যদি বাঁধা থাকে, তাহলে এ ধরনের অপকর্ম কখনই বন্ধ হবে না। সন্ত্রাসী যে দলেরই হোক, তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাস্তবে এর প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না। অপরাধ দমনে আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারের। রাজনৈতিক প্রভাবে কোন অপরাধী যেন পার পেয়ে না যায়, সরকারের উচ্চপর্যায় থেকে তা নিশ্চিত করতে হবে। যখন যে দল ক্ষমতায় থাকে, তাদের সহযোগী ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীদের চাঁদাবাজি-টেন্ডারবাজি উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছে। ছাত্রনেতাদের কতটা অধঃপতন ঘটলে তারা ছিনতাই-সন্ত্রাসে ইন্ধন দেয় তা বোধগম্য। ছিনতাইয়ে জড়িয়ে পড়ছে শুধু ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন নয়, বিরোধী দলের ছাত্র সংগঠনও। শুক্রবার সিলেটে ছিনতাইয়ের প্রস্তুতিকালে ছাত্রদলের ছয় ক্যাডার গ্রেফতার হয়েছে। ছাত্র সংগঠনগুলোর এ পরিণতির দায়দায়িত্ব মূল রাজনৈতিক দল এড়াতে পারে না। চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, সন্ত্রাস, ছিনতাইয়ে জড়িতদের জন্য সবচেয়ে বড় শাস্তি হবে প্রমাণ পাওয়া মাত্র দল বা সংগঠন থেকে তাদের বহিষ্কার করা। দলের কোন নেতা তাদের ব্যবহার করলে বা আশ্রয়-প্রশ্রয় দিলে, তার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিতে হবে। ছাত্রলীগের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তথ্য চেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে যে চিঠি পাঠানো হয়েছে, এর জবাবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে প্রদান করতে হবে নিরপেক্ষ রিপোর্ট। ছাত্রলীগের নেতাদের ভয় পেলে চলবে না। সরকারকে এ ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, সঠিক রিপোর্ট না পেলে সরকার কোন ব্যবস্থা নিতে পারবে না। ছাত্রলীগ চলবে এখনকার মতো নিয়ন্ত্রণহীনভাবেই।